দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 JAN 1992 পৃষ্ঠা 4 কলাম 2

সংবাদ

ঢাকা ঃ রোববার ১২ই মাঘ ১৩৯৮

ছাত্রীদের অবৈতনিক শিক্ষা

খবরে প্রকাশ, সমাজে নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে পৌর এলাকার বাইরে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীরা অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ পাবে বলে উত্তরা গণভবনে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'সিদ্ধান্ত নেয়া' হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরকারের প্রবর্তিত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা ইতিমধ্যেই অবৈতনিক করা হয়েছে।

বিগত সরকারের আমলে ১৯৯০ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি এক সরকারী সার্কুলারের মাধ্যমে জানানো হয়েছিল যে, ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে পৌর এলাকা বহির্ভূত সরকারী, বেসরকারী, প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসায় ১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নরতা সকল ছাত্রী বিনাবেতনে পড়ার অধিকারী।

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের অবৈতনিক শিক্ষার যে সিদ্ধান্ত দু'বছর আগে নেয়া হয়েছিল এবং যে সিদ্ধান্ত এতদিন ধরে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, সেই সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার বৈঠকে নতুন করে নেয়া হলো কেন তা কারো কাছে পরিষ্কার নয়।

১৯৯০ সালে জাতিসংঘের ঘোষিত কন্যাবর্ষ এবং ইউনেস্কোর সাক্ষর দশক সামনে রেখে বিগত সরকার এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছিল। সমাজে পিছিয়ে পড়া মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত সুযোগের আশ্বাস দেশে-বিদেশে প্রশংসা কুড়িয়েছিল। তবে বাস্তবে দেখা গেল নারী শিক্ষা প্রসারের চেয়ে সস্তা প্রশংসা কুড়ানোই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই অবৈতনিক শিক্ষার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। সরকারী নির্দেশে বেসরকারী স্কুলের ছাত্রী বেতন মওকুফের ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা থাকলেও বছরের ৮/৯ মাস চলে গেলেও সেই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে সকল বেসরকারী স্কুল আর্থিক সঙ্কটে পড়েছিল। বেসরকারী বালিকা বিদ্যালয়গুলোর দুর্গতি তো চরমে উঠেছিল। এসবের জের এখনও চলছে।

প্রথমদিকে কারো কোন ধারণা ছিল না কোন্ স্কুলকে কত টাকা দিতে হবে। কিভাবে দেয়া হবে তাও পরিষ্কার ছিল না। বেতন মওকুফ করার পর আর্থিক ক্ষতির যে তথ্য স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া গেল তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হলো। নানা ধরনের জরিপের পর বছরে 'ক্ষতিপূরণ' হিসেবে ২২/২৩ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে ধরা হয়েছিল; কিন্তু টাকা দেয়ার বেলায় দেয়া হয়েছিল তার অর্ধেকেরও কম। অর্থাৎ সরকার নির্দেশ দিয়ে বেতন মওকুফ করলো, স্কুলগুলোর অর্ধেক ক্ষতিও পূরণ করা হলো না; ঘাটতি পূরণের গুরুভার অর্পিত হলো স্কুল কর্তৃপক্ষের ওপর। দেশের এই দুর্দিনে কোন স্কুলের পক্ষেই এই ভার বহন করা সম্ভব হচ্ছে না; বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকরা অভুক্ত থাকছেন।

যে সকল স্কুলের আংশিক বেতন সরকারী অনুদান থেকে আসে ঐসব স্কুলের শিক্ষকদের পরিবার পরিজন আধপেটা খেয়ে দিন গুজরান করছে। আর কোন সরকারী অনুদান ছাড়াই যে সকল স্কুল চলে তাদের ক্ষতিপূরণ না হওয়াতে শিক্ষকদের দুর্গতি চরমে উঠেছে।

গত বছরেও ১৯৯০ সালের মত আংশিক ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা ছিল। প্রথম ৬ মাসের টাকা দেয়া হলেও পরের ৬ মাসের টাকা এখনও বাকী। এইটুকু টাকার জন্য আরো কতদিন অপেক্ষা করতে হবে কে জানে।

অঙ্গীকার সত্ত্বেও ঘাটতির পুরোটা সরকারের তরফ থেকে না দেয়ার অজুহাতে অনেক স্কুলে নাকি ছাত্রীদের কাছ থেকে বেতন আদায় করা হচ্ছে। অনেক স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা বাড়িয়ে দেখানো হচ্ছে। আবার স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছেন, নিরুপায় হয়েই তারা দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছেন।

বেতন মওকুফের ক্ষতিপূরণের টাকা পয়সা কোন্ খাত থেকে কতটা আসবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছাড়াই বিগত সরকারের আমলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এই টাকা ভর্তুকি হিসেবে সরকারের রাজস্ব আয় থেকে আসবে, না উন্নয়ন বাজেট থেকে আসবে অথবা মানব সম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ হিসেবে আসবে, তা কারো কাছে পরিষ্কার নয়।

সরকারের রাজস্ব আয়ে ঘাটতি, উন্নয়ন বাজেটের প্রায় সবটাই বিদেশী দান-অনুদাননির্ভর এবং দাতারা এই ক্ষতিপূরণকে ভর্তুকি হিসেবে ধরে নিচ্ছেন বলে সেখান থেকে টাকা পয়সা নেয়া যাচ্ছে না।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে ছাত্রীদের বেতন মওকুফ করার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবেলা করা যায় সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত ছিল। ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলগুলোর শিক্ষাদানের মান নিচে নামছে, বিনাবেতনে ছাত্রী ভর্তি করার ব্যাপারে স্কুলগুলোর উৎসাহ কমে যাচ্ছে। শিক্ষকরা অভুক্ত থাকছেন। ক্ষতিপূরণের পুরো টাকা কিভাবে স্কুলগুলোকে দেয়া যায় ইত্যাদির পর্যালোচনা ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত যখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, তখন দু'বছরের একটা পুরানো সিদ্ধান্তের কথা নতুন করে কেন বলা হলো তা ভুক্তভোগী শিক্ষক, ছাত্রী ও অভিভাবকদের কাছে দুর্বোধ্যই হয়ে থাকবে।